Interview details

Interview with Tunazzina Sahrin

Interviewed by Md Mufazzal Hossain Rumon

রুমনঃ আপনি আপনার পরিবার থেকে কারও কাছ থেকে শুনা ১৯৪৭ সালের দেশভাগ নিয়ে কোন গল্প, ঘটনা কিংবা স্মৃতি থাকলে আমাদেরকে বলুন। আমরা আপনাকে বাধা দিব না। আমি শুধু নোট নিব, আপনি চালিয়ে যাবেন।

তুনাজ্জিনাঃ আমার পরিবারের আমি আমার নানুর কাছ থেকে ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের গল্প বা স্মৃতি সেটা শুনেছি। আমার নানু মানে একমাত্র উনি আমাদের পরিবারের সাক্ষী যিনি ওইভাবে আমাকে বর্ণনা করেছেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়কার স্মৃতিগুলো বা তার আগের স্মৃতিগুলো বা যে কারণে তাদের বাধ্য হয়েছিল '৪৭ সালের দেশভাগের পর তাদের নিজেদের দেশ কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশে মুভ করতে সেই স্মৃতিগুলো আমার নানুর কাছ থেকে শুনেছি। আমার নানুর জন্ম ১৯৪০ সালে। কলকাতার বিডন স্ট্রিটে তাদের পৈত্রিকবাড়ি ছিল। ওখানেই আমার নানু, নানুর বাবা মায়ের সাথে মানে আমার গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ফাদার ও গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড মাদারের সাথে থাকতেন। তারা তিন বোন ছিলেন। আর সাথে থাকত তাদের চাচি। তো আমার প্রপিতামহ মানে আমার নানুর বাবার ব্যবসা ছিল কন্ট্র্যাকটরের ব্যবসা। আর পৈত্রিকভাবে তাদের কিছু পাথরের ব্যবসা ছিল। তারা কলকাতাতেই ব্যবসা করছিল। কিন্তু যে কারণে সমস্যাটা তৈরি হয় সেটা ১৯৪৬ সালের আগেও এবং ১৯৪৬ সালে বিশেষ করে খুব ফ্রিকোয়েন্টলিভাবে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। ১৯৪৬ সালে সেটার সংখ্যাটা খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল এবং এর মাত্রাটাও খুব বেশি প্রকট আকার ধারণ করে। সেইরকমভাবে তাদের কাছ থেকে শুনা একটি গল্প হচ্ছে প্রথমে তাদের পাড়ায় কোন সমস্যা হয়নি। প্রথমত যেটা হয়েছিল তাদের পাশের যে এলাকা বা পাড়া থেকে হিন্দুরা চলে এসেছিল তাদের পাড়ায় শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে মেরে ফেলবে। মেরে ফেলবে নট অনলি মেরে ফেলবে, তাদের মারার ভঙ্গি ছিল তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলা। এবং এরকমও শুনেছি যে ঠিক ঐ মুহূর্তে যে তারা সিদ্ধান্ত নিতে তারা বাধ্য হয় যে তারা তাদের বাড়ি ছেড়ে

চলে আসবে সেটা হয়েছিল যে ওটা ঐসময় ঐ ঘটনাতে মসজিদের ভিতরেও যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকেও কেটে ফেলা হয়েছিল। এবং তখন আমার নানুর বয়স ছিল ৬, ১৯৪৬ সালে। তখন আমার নানু যখন তাদের বাসা ছেড়ে আরেকটি বাসায় মানে আশ্রয়ের জন্য যান তখন তার বর্ণনা ছিল যে আমাদের বাসার সামনে আমার নানু দেখেছিল যে সারি সারি লাশ পড়ে আছে এবং ঐ লাশগুলো পেরিয়ে বাসা থেকে বের হতে হচ্ছে এবং আশ্রয়ের জন্য তারা যেই বাসা যাচ্ছে সেই বাসাতে তাদের ঢুকতে হচ্ছে। তখন রায়ট শুরু হচ্ছিল ১৯৪৬ সালে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার প্রথমত হচ্ছে হিন্দুরা অ্যাটাক করে এবং বারবার বলেছিল যে মুসলমানদের কেটে ফেলতে হবে। তখন আমার নানুর বাবা যেহেতু অনেক পুরানো বাসিন্দা এবং ওখানেই থাকে, উনি চিন্তা করেছিল যে আমরাতো অনেকদিন ধরেই ভালছিলাম, হিন্দু-মুসলিম একসাথে। হয়ত বা তাদের কাছে অনুরোধ করলে বা তাদের সাথে কোন কথা বললে হয়ত এটার কোন সুরাহা হবে। এবং উনি এটা চিন্তা করেই যাচ্ছিলেন। অন্যপাড়া থেকে যারা এসেছে তাদের সাথে মিটমাট করতে। কিন্তু সেইসময়ে আমার নানুর বাসায় প্রতিদিন যিনি দুধ দিতেন যে গোয়ালা উনি বিষয়টা বুঝতে পারে এবং তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তার বাড়িতে এবং উনি হিন্দু ছিলেন এবং উনি যেই কথাটি বলে সেটা আমার নানু এখনও বলে 'দাদা আপনি করছেন কি? ওরা আপনাদের কোন কথা শুনবেনা, আপনাকে কেটে ফেলবে...' বলে উনাকে নিয়ে যায় এবং তার ঘরে নানুর বাবাকে তালা বন্ধ করে আটকে রেখে দেয় বলে, আপনি এখানে ঘুমিয়ে থাকেন। তো ওই ঘটনার বাইরে মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে। তখন আমার নানুদের কাছে খবর চলে গেছে যে, নানুর বাবাকে কেটে ফেলা হয়েছে। তখন হচ্ছে যে নানুর মা, নানুর তিন বোনকে নিয়ে এবং নানুর চাচি, উনি নিঃসন্তান ছিলেন, এই কয়েকজনকে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মানে তাদের বিডন স্ট্রিট এর পৈত্রিক বাড়ি থেকে। বের হয়ে তারা তখনকার থানার যে পুলিশ অফিসার মানে থানার ওসি ছিলেন তার কাছে আশ্রয় নেন। উনার নাম ছিল সিদ্দিক সাহেব এবং উনি মুসলমান ছিলেন। কারণ উনি ছিলেন আমার নানুর চাচার বন্ধু। ওনার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। ঐ থানাতে তাদেরকে একটা ঘরে বসিয়ে রাখে এবং আশ্রয় দেয়। অবস্থা একটু যখন শান্ত হল একদিন বা দুইদিন পরে তখন তারা

তাদেরকে পাশের একটি পাড়াতে শিফ্ট করে। ওই পাড়াটি ছিল মাড়োয়ারি পাড়া। মাড়োয়ারি পাড়াতে অনেকগুলো বাড়ি খালি পড়েছিল। এবং বাড়িগুলো যেহেতু মাড়োয়ারিদের বাসা, অনেক বড় বড় রুম। ওসি সাহেব মানে এভাবেই ডিস্ট্রিবিউট করে যে এক একটা পরিবারের জন্য আশ্রয় তো অনেকেই নিয়েছে, পুরো পাড়াই অলমোস্ট মুসলমানদের খালি করে চলে এসেছে। যে তারা বাড়িতে এক একটা পরিবারের জন্য এক একটা ঘর বরাদ্দ। এবং মাড়োয়ারি পাড়াতে যেই বাসায় তারা আশ্রয় পায়, সেই বাসার নিচতলায় একটা লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। উপরতলার ঘরগুলিতে এক একটা পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। তারা থাকত এবং নিচতলায় খাবারের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং সেখানে রান্না হত। এটা চলতে থাকে যতক্ষণ রায়টটা পারসিস্ট করছিল। আর একটা জিনিস খুব নোট মানে আমার মেমরিতে দাগ কাটে সেটা হল সেই ওসির কাছে যাওয়ার আগে তারা একটা বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় পায়, তাদের পাশের বাসায় এক হিন্দু বাসাতে এবং তারা তখন তাদেরকে তাদের পূজার ঘরে আটকে রেখেছিল। পূজার ঘরে ভিতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেয়, যাতে মনে না হয় পূজার ঘরে কোন মুসলমান পরিবার বা মুসলমান কোন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের নিজস্ব প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আশ্রয়টা পায়। তার পর তারা থানাতে মুভ করে এবং থানা থেকে তারা দুইদিন পর মাড়োয়ারি পাড়াতে শিফ্ট করে। এরপর এখানে তারা বেশ কিছুদিন থাকে। ওই পুলিশ অফিসারকে পরে সাসপেন্ড করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি অনেক মুসলমানদের বাঁচিয়েছেন, অনেককেই তাদের পাড়া থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। ওই পুলিশ অফিসারকে মানে সাসপেন্ড করা হয়। ওইসময় এরপর দাঙ্গাটা যখন থেমে যায় তখন আমার নানু, নানুর বাবা-মা, তাদের চাচি ও তিনবোন কলকাতা ছেড়ে শিলং-এ মুভ করে। শিলং-এ ছিল আমার নানুর ফুফুরা থাকত। ওনাদের বাসায় তারা আশ্রয় নেয়। কারণ কলকাতায় অলমোস্ট তাদের পৈত্রিক ব্যবসা যেটা ছিল সেটা শেষ। আমার নানুর বাবার যে কন্ট্র্যাকটরের ব্যবসা সেটা শেষ। বাড়ি অলমোস্ট খালি, লুট হয়ে গেছে। দখল হয়ে গিয়েছিল। আমার নানুর চাচার থিয়েটারের ব্যবসা সেটাও তখন ছিল। তার কিছুদিন আগেই উনি মারা যান। পরে আমার নানুর চাচি নানুদের সাথেই থাকতেন। এরপর সবাই

তারা শিলং-এ মুভ করে এবং তারা শিলং কিছুদিন স্টে করে। ইতি মধ্যে নানা কারণে মূলত অর্থনৈতিক কারণে চিন্তায়, তারপর তিন মেয়ের, পরিবারের নানারকম চিন্তায় আমার নানুর বাবার স্ট্রোক হয়। এবং তখন তারা শিলং-এ ছিল। স্ট্রোক করার পর বেশিদিন না হলেও মাস ছয়েক পর্যন্ত বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তারপর তিনি মারা যান। শিলং-এ মারা যায়। তারপর আমার নানুর মা আবার উনাদেরকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এতদিনে পরিস্থিতি কিছুটা ঠাণ্ডা। ফিরে আসে তারা পার্ক সার্কাসের কাছে, আমার নানুর চাচির বাসায়। আগে ছিল কলকাতার বিডন স্ট্রিটে আর এখন তারা ফিরে আসল পার্ক সার্কাসের কাছে। তখন আমার নানুর মা চিন্তা করছিলেন তার তিন মেয়েকে নিয়ে তিনি কি করে সামনের দিনগুলো কাটাবেন... এরকম অনিশ্চয়তা। অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও তখন সব কিছুর সুরাহা হয়নি। মানুষরা অনেক রকম ভয়, নানা রকম ভীতিকর কথা বলত যে, আসলে যে কোন সময় হামলা হতে পারে। উপরন্তু তার স্বামীও মারা গেছে। তখন আমার নানুর মা চিন্তা করল যে, কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসবেন। এবং যেহেতু আমার নানুর চাচি নিঃসন্তান ছিলেন, সেইসময় তিনি খুব আদর করতেন আমার নানুর মেজ বোনকে। তাই নানুর মা আসার সময় তার মেজ মেয়েকে উনার কাছে দিয়ে আসেন এবং নিয়ে আসেন তার দুই মেয়েকে। নানুকে এবং নানুর ছোট বোনকে। একটা মেয়েকে উনার জায়ের কাছে রেখে দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি চিটাগাং-এ মুভ করেন প্রথমে। চিটাগাং-এ এক আত্মীয়ের কাছে তিনি কয়েকমাস থাকেন। তারা ঠিক রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় না, ধর্মের সম্পর্কের আত্মীয় ছিল। সেখানে কিছুদিন থাকার পরে উনি চিটাগাং থেকে বগুড়ায় মুভ করেন। বগুড়ায় নানুর মার দুই বিঘা ছিল। ধানি জমি। উনি কিছুদিন বগুড়ায় থাকলেন। এবং এই সময় তিনি চলছিলেন তার গয়নার বিক্রির টাকায়। যেগুলো উনার গয়না ছিল, সেগুলো উনি পালাবার সময় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। বাড়িটি তখনও বিক্রি হয়নি। বাড়িটি ইন্ট্যাক্ট ছিল। গয়নার বিক্রির টাকাতে উনি বিক্রি করে করে চলছিলেন। এবং কিছুদিন পর উনার একজন আত্মীয় কাছে শুনেন, উনি মাঝেমাঝে আবার কলকাতায় যেতেন। আমার নানুর মেজ বোনকে রেখে এসেছিলেন তো উনাকে দেখতে, বাড়ি দেখতে কলকাতায় যেতেন। তো উনি খবর পেলেন যে বাড়ি ছিল বিডন স্ট্রিটে ওইখানে উনারা

ভাড়াটিয়া আছে। তারপর উনি দেখতে গেলেন। এবং শুনলেন ওইখানে ভাড়াটিয়া আছে এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকাও তুলা হয়। পরে উনি জিজ্ঞেস করলেন কে টাকা তুলে। পরে শুনা গেল আমার নানুদের এক আত্মীয় বাসাটি পরিত্যক্ত না অর্থাৎ মালকিন চলে গেছেন এই সুযোগে ভাড়াটিয়া বসিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে মাসের পর মাস ভাড়ার টাকা তুলছেন। তখন আমার নানুর মা ভাড়াটিয়াদের সাথে ডিটেলস কথা বলেন এবং বলেন এই বাসার ভাড়া যেন পরবর্তীতে আর যাতে অন্য কাউকে ভাড়া না দেওয়া হয়। এইরকমভাবে আয়ের একটা সংস্থান হল। এরপর তিনি কয়েক মাস কলকাতায় গিয়ে গিয়ে ভাড়ার টাকা নিয়ে আসতেন। প্লাস সঞ্চয় হিসাবে গয়না ছিল। সেগুলো বিক্রি করে করে চলছিল। কিছুদিন পর উনার মনে হল এভাবে প্রতিবার ভাড়ার টাকা তোলার জন্য বগুড়া থেকে কলকাতা যাওয়া সম্ভব নয়। তখন যাতায়াত ব্যবস্থাও এতটা সুবিধার ছিলনা। এবং সেটা চিন্তা করে তিনি বাড়িটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। বাড়ি বিক্রি করে ফেলেন। কিন্তু বাড়ি বিক্রির টাকাটা কোর্টে জমা দিতে হল। কারণ কোর্টের ভাষ্য ছিল যেহেতু তার তিনটা মেয়ে নাবালিকা, এবং উনিও বিধবা, কিন্তু খুব ইয়াং ছিলেন। ২২ বছর বয়সে আমার নানুর মা বিধবা হয়েছেন। উনি যদি পরবর্তীতে আবার বিয়ে করেন বা তার তিন মেয়েকে রেখে চলে যান সেক্ষেত্রে এই তিন মেয়ের দেখাশুনা বা ভবিষ্যৎ কি হবে? সেইজন্যে বাড়ি বিক্রির টাকা কোর্ট বা সরকার থেকে নানুর মায়ের হাতে দেয়নি। তারা কোর্টে রেখেছিল টাকাটা। কোর্ট থেকে প্রত্যেক মাসে মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মানে তিনটা মেয়ের ভরণ-পোষণের হিসেবে যত টাকা হয় এই হিসেবে টাকা দেওয়া হত। এভাবেই চলতে লাগল। ইতিমধ্যে বগুড়াতে নানুর মার থাকা ভাল লাগল না। কারণ তখন খুবই প্রত্যন্ত ছিল এলাকা। কলকাতা কম্পারেটিভলি বেটার ছিল। যে কারণে কলকাতা থেকে মুভ করে তারা কোথাও কম্ফর্ট পাচ্ছিল না। চট্টগ্রাম, বগুড়া কোথাও এসেই আরাম পাচ্ছিল না। তারপর বগুড়াতে তার যে জমি ছিল জমি বিক্রি করে দেন এবং বিক্রি করে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকাতে উনি থাকতেন নারিন্দাতে। তখন তিনি একটা এনজিও, সেই সময়কার প্রথম এনজিও 'ভিলেজ এইড'-এ চাকরি করেন। তখন অলমোস্ট ঢাকা শহরের আশপাশ গ্রামই ছিল। উনি গ্রামে গিয়ে মেয়েদের বিভিন্ন সেলাই শিখাতেন, এবং

বিভিন্ন ছোটখাট কাজ শিখাতেন। মানে 'ভিলেজ এইড' বলত। সেখানে উনি চাকরি নেন এবং কাজ করতে থাকেন। তখন আমার নানু ও তার দুই বোন স্কুলে পড়ত। এরপরে এভাবেই চলতে থাকে প্রায় অলমোস্ট ৮ বছর। ১৯৫৫ সালে আমার নানুর বিয়ে হয়। তখন আমার নানুর বয়স ১৫ বছর। বিয়ের পর আমার নানুর মা তখন আমার নানু ঢাকাতেই থাকত কিন্তু আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার নানুর কাছে মাঝেমাঝেই নানুর ছোট বোনটা থাকত। আবার মাঝেমাঝেই উনি আবার নানুর মায়ের সাথে মুভ করত। উনাকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় যেতে হত। ঢাকার বাইরে, ঢাকার আশেপাশে যেতে হত। তখন ও সময়টা আমার নানুর কাছ থেকে শোনা তার ছোটবোনের জীবনটা বেশি স্ট্রাগল ছিল। কারণ খুব ছোট বয়সে তার তো আগেরকার কোন স্মৃতি নেই। কিন্তু সে কনটিন্যুয়াস মুভ করছে তার মায়ের সাথে। সে এতই ছোট ছিল যে তাকে স্কুলে দিবে সেইরকমও নেই। এমনও হয়েছে যে তাকে মানুষের বাসায় রেখে চাকরি করতে যেতে হয়েছে। উনার লাইফটা অনেক স্ট্রাগলের কম্পারেটভলি আমার নিজের নানুর। ইতিমধ্যে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমার নানু ঢাকায় ছিল। এরপর আমার নানা বদলি হয়ে যায় যশোরে। এরপর ১৯৬০-১৯৬৩ সালে আমার ছোট নানুর বিয়ে হয়। বিয়ে হওয়ার পর আমার নানা যিনি ছিলেন অর্থাৎ আমার ছোট নানুর হাজবেন্ড নানুর মাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নেন। যে উনার তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তাই কেন উনাকে কষ্ট করে কেন আর চাকরি করতে হবে। তাই তখন আর তিনি চাকরি করতেন না। উনি আমার নানুর ছোটবোনের সংসারেই থাকতেন। মাঝেমাঝে নানু তত দিনে যশোরে ট্রান্সফার হয়ে গেছে আমার নানা। মাঝেমাঝে ওখানে থাকত। মাঝেমাঝে ঢাকায় থাকত। আবার মাঝেমাঝে মেজ নানুর কাছে কলকাতায় যেতেন। এভাবে উনি মুভ করত... এরপর আমার নানুর কাছ থেকে পরবর্তীতে যা শোনা আমাদের নানুদের লাইফটা মোটামুটি সেটেল হলেও তাদের মনে যে ওই সময়ের যে খারাপ বা দুঃখ বা স্মৃতি বা অভিযোগ সেগুলো আমি আমার খুব বেশি পরিমাণে দেখেছি। মানে এখনও আমি যদি মাঝেমাঝে নানুকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার কি মনে হয় দেশভাগ ভাল বা খারাপ মানে তোমার কি মতামত। তখন আমার নানু আমাকে একটা কথায় বলে যে, কিছু একটা থাকত। আমার বাবাও মারা গেল আবার দেশও চলে গেল। আমার

নানুর কাছে যে জিনিসটা আমার কাছে খুব বেশি ইম্পরট্যান্ট মনে হয়, যে দেশপ্রেমটা খুব বেশি ইম্পরট্যান্ট কারণ আমার নানু অনেক কিছুই বুঝে না কিন্তু সে বারবার এটা ফোকাস করে তাকে তাদের দেশ ছাড়তে হয়েছে। এটা খুব সিগনিফিকেন্ট মনে হয়। এবং এটা সে খুব জোর দিয়ে বলে যে আমাকে আমার দেশ ছাড়তে হয়েছিল। আমি চলে আসছি, আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু যদি আমার দেশটা থাকত আমার নিজের লোকদের আত্মীয়দের... আমি অনেক ভাল ফিল করতাম। এটা উনি বলতে চায়। ইভেন পরবর্তীতে আমি বিভিন্ন সময় নানাভাবে আমরা তো এখন মুখের কথায় ইজিলি বলি যে কোন একটি অকেশন পেলে হয়ত আমরা আমাদের জাতীয় পতাকার রঙে ড্রেস পরে বলি যে আমরা খুব দেশপ্রেমিক। কিন্ত প্রকৃত দেশপ্রেম বলতে একচুয়েলি আমি দেখি আমার আমার নানুর মধ্যে। আমার কাছে শিক্ষণীয় মনে হয় যে জিনিসটা সে বুঝে না, যে জিনিসটার সম্পর্কে তার কোন আইডিয়া নেই, কিন্তু সে শুধু ওই জিনিসটাকে এভাবেই বিচার করবে, যে সেটা তার নিজের দেশ কিনা। যখনি কোন টপিক আসে ভারত নিয়ে বা অন্য যে কোনও টপিক থাকে আমার নানু সবার আগে মেনশন করবে সেটা তার নিজের দেশ এবং সে সেটাকেই সাপোর্ট করবে। সেটা খেলা হউক হোয়াটেভার কালচারাল অনুষ্ঠান হউক, অথবা অকেশন হউক সে ওটাকেই মেজার করবে। আমাদের কাছে এটা শুনেছি যে, খাবার-দাবার, রান্না-বান্না সবকিছু কম্পেয়ার করতে। এখানকার মানুষ এভাবে রান্না করে, ওখানে আমরা ওইভাবে রান্না করি। বিয়ের অনুষ্ঠানে কোথাও গিয়েছি কিন্তু সে ওইভাবেই বলতে থাকবে, যে এখন এইভাবে হয়, কলকাতায় আমরা এইভাবে করতাম না। অনুষ্ঠানটা এইভাবে করতাম। এখনতো গ্লোবালাইজেশনের যুগে সব কিছু এক হয়েছে। ওখানকার কিছু জিনিস আমরা গ্রহণ করেছি, আর আমাদের কিছু ওরা। যে জিনিসগুলো মানে, মানে, খুবই **কন্সট্যান্ট** থাকে, সেইধরনের জিনিসগুলি সে বলতে থাকবে। যে এই জিনিসগুলো কলকাতায় হত যেটা এখানে হয়না। খাবারের বেলায় দেখেছি মিষ্টির প্রাধান্যটা একটু বেশি। কলকাতার রান্নায় মিষ্টি একটু ব্যবহার করা হয়, সে খুবই মিষ্টি জিনিস বেশি পছন্দ করে। এবং পরবর্তীতে যদি তার কোন জিনিস মনোমত না হয় যে আমি এই জিনিসটা এইভাবে পছন্দ করিনা। বাংলাদেশের লোকরা এইভাবে করে। এবং এটা নাকি আমার নানুর মাও প্রায়ই

বলত, কলকাতার সাথে এখানকার মানুষের অনেক অনেক পার্থক্য। তারা কলকাতা থেকে দেখে দেখে অনেক কিছু শিখছে। এই জিনিসটা তাদের মন থেকে কখনই মুছে ফেলা যায়নি যে এইটা তাদের অরিজিনাল দেশ না। তারা ওইখানের মাইগ্রেন্ট। তারা বাধ্য হয়েছিল মাইগ্রেট করে এখানে আসতে। মানে সেটা ভৌগলিক কারণে হউক বা রাজনৈতিক যে কোন কারণেই হউক, এইতো।

রুমনঃ আপনি তো বলেছেন আপনার নানু বাংলাদেশে যখন এসেছেন তখন অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। তো সেই জায়গায় বেড়ে উঠা, হঠাৎ করে এখানে চলে আসা এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। কিংবা পড়া-লেখার একটা ব্যাপার ছিল, চাকরির একটা ব্যাপার ছিল। তো ওই পরিবেশ থেকে এই পরিবেশে এসে উনি যে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, ওটা তিনি কিভাবে কাটিয়ে উঠেছেন?

তুনাজ্জিনাঃ প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিলো মূলত কলকাতাতেই। মানে বাংলাদেশে আসার পরে বাংলাদেশের মানুষজন মানে আমি যতটুক শুনেছি মানে যথেষ্ট কোঅপারেটিভ ছিল। যে তাদের পারিপার্শ্বিক মানুষদের কাছ থেকে কোন ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হয়নি। সবাই তাদের কে যথেষ্ট সাপোর্ট করেছিল কারণ তারা জানত যে তারা বাধ্য হয়েছে তাদের বাড়িঘর ছাড়তে। বাংলাদেশে মুভ করতে। কিন্তু বাংলাদেশে সে যে প্রতিকূল অবস্থার ফেস করতে হয়েছে নতুন করে, সবকিছু, নতুন করে শুরু করা। মানে শূন্য থেকে আবার নতুন করে শুরু করা বলতে যা বুঝি। আর যেহেতু তখন মানে মাথার ওপর মানে মুরুব্বি বলতে কেউ ছিলনা, মানে আমার নানুর বাবা ছিলেন না, মানে খুব রিসেন্টলি উনি মারা গেছেন। ৬ মাস ১ বছর আগে মারা গেছেন। সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু আশেপাশের মানুষদের কাছ থেকে যে অসুবিধা যা তৈরি হওয়া বলেন বা প্রতিবেশী বলেন নতুন পরিবেশ সেইরকম সমস্যা কম্পারেটিভলি খুব কমই পড়তে হয়েছে বাংলাদেশে। মানে সবাই তাদের যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে তাদেরকে সমর্থন করেছে যে তারা বাধ্য হয়েছে তাদের সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে। নতুন জায়গায় মুভ করতে। ধর্মের

কারণে... দেশের রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাদের মানে ওই ধরনের কোন সমস্যা খুব একটা বেশি ফেস করতে হয়নি।

রুমনঃ আপনার কাছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তো জানেন যে আমাদের দুই বাংলাকে বর্ডার নামক এক চার দেয়াল দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। যদিও আমরা একই ভাষাভাষী মানুষ, আমাদের কালচারাল দিক দিয়েও অনেক মিল আছে। তো সেই বর্ডারটিকে আসলে আপনি কিভাবে দেখেন?

তুনাজ্জিনাঃ বর্ডারটাকে আমার কাছে মনে হয় শুধুমাত্র ভৌগলিক এবং রাজনৈতিকভাবেই উপস্থাপন করা হয়। কারণ পশ্চিমবাংলা তথা বাংলাদেশ অলমোস্ট ভাষা একই রকম। আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেও কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষার বিভিন্ন প্রচলন রয়েছে। সেইভাবে হয়ত কলকাতা, উড়িষ্যা, মুর্শিদাবাদও কিছুটা ডিফারেন্স থাকে। শুধুমাত্র বর্ডার দিয়ে একই ভাষার দুইটা এলাকাকে ভাগ করে দিবে বা একই অঞ্চলের মানুষ যাদের অলমোস্ট একই কালচার মেইন্টেইন করি। একই পোশাক, একই খাবারের খাদ্যাভ্যাস। তাই সব দিক দিয়ে আমার কাছে মনে হয় না এই বর্ডারটা মানসিকভাবে শক্ত মানে কিছু তৈরি করতে পারে। কারণ শুধুমাত্র ভৌগলিক ও রাজনৈতিকভাবে আমার কাছে মনে হয়। তাই বর্ডার যেটা বলা হয় ভৌগলিকভাবে করা হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রুমনঃ আপনি তো বলেছেন যে আপনার নানু সেখানকার অনেক বিষয়গুলোই আপনাদেরকে বলছেন, যে খাবারে মিষ্টি দেওয়া বা কালচারের দিক দিয়ে বা খাবারের দিক দিয়ে, এই সম্পর্কে ডিটেলস যদি আমাদেরকে একটু বলতেন...

তুনাজ্জিনাঃ যেই জিনিসগুলোর কথা উনি খুব মানে বারবার বলেন, সেটা হচ্ছে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের একটা তুলনা তিনি সবসময় দেয় যে কলকাতার বিয়ের অনুষ্ঠান গুলোতে যখন গেস্ট আসে গেস্টকে নাকি প্রত্যেককে নাকি আলাদা করে মিষ্টি ও শরবত দিয়ে আগে আপ্যায়ন করা হত। তার পরে মূল খাবার বা মূল ডিসটা দেওয়া হত। কিন্তু বাংলাদেশে তো সবসময় মানে এখন হয়ত বা

এটা এরকমভাবে প্র্যাকটিস করা হয়, কিন্তু নরম্যালি আগে ওরকমভাবে প্র্যাকটিস করা হত না। এটা সে আমাকে অনেকবারই বলেছে যে কলকাতার কেউ আসলে বরপক্ষ আগে মিষ্টি দেওয়া হবে শরবত দেওয়া হবে তারপরে তাকে মূল খাবার দেওয়া হবে। ডিরেক্ট নিয়ে মূল খাবারের ওখানে নিয়ে বসায়ে দেওয়া হবেনা যেটা এখানে হয়। এটা তার মনের একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পোশাক আশাকের ব্যাপারে সে কিছুটা বলে যে মানে আমরা এখানে যে এটা খুবই সিগনফিকেন্ট যে আমরা, বাংলাদেশের মানুষরা নাকি এটা বুঝি না কোথায় কোন পোশাকটা পরতে হবে। বাইরে যাওয়ার মানেই খুব ঝলমলে কাপড় পরে চলে যাওয়া এটা সে রকম না। মানে সে বলতে চায় যে কলকাতার মানুষজনের এতটুকু সেন্স আছে মানে তার দেশের মানুষের এতটুকু সেন্স আছে যে তারা বোঝে যে ডাক্তারের কাছে যেতে হলে কোন পোশাক পরতে হবে, বিয়েতে গেলে কোন পোশাক পরতে হবে, বেড়াতে গেলে কোন পোশাক পরতে হবে, যেটা নাকি আমরা বুঝতে পারিনা বাংলাদেশের মানুষেরা। এবং আরেকটা ব্যাপারে সে মাঝেমাঝে বলে, অনুষ্ঠানে মানে সব কিছু ফলো করা করা হত। যেটা বাংলাদেশের মানুষ খুব একেবারেই সব কিছু সেরে ফেলতে চায়। মানে দায়সারা গোছের, সংক্ষেপে। কিন্তু কলকাতাতে সেটা কখনই হবেনা। কলকাতাতে সব অনুষ্ঠানেই নাকি স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে। আসলে বাংলাদেশের মানুষরা তাদের অর্থনৈতিক কারণে চিন্তা করে যে সংক্ষেপে সব কিছু ম্যানেজ করা। কিন্তু এটা তার কাছে একটা পার্থক্য তুলে ধরে। আর খাবারের ব্যাপারটা হচ্ছে সে জাস্ট আমাদের কাছে শেয়ার করে, কিন্তু তা করার জন্য আমাদের উপর কখনই চাপিয়ে দেয় না। তা আমি আমার মায়ের কাছে দেখেছি, কিংবা মামির কাছে শুনেছি। কখনই আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়না। ইনফ্যাক্ট যে যেভাবে চলতে চায়, সে শুধু শেয়ার করে। কিন্তু কখনই কাউকে এভাবে এটাই করতে হবে, এই রকম কোন অভ্যাস আমার নানুর নেই।

রুমনঃ মানে উনি কি আর বলেছেন, যে ওই খাবারগুলা, সেই সময়ের কলকাতার খাবার বা ওই জিনিসটা বেশি প্রচলন ছিল। আমরা সেই সময়ের গান শুনতাম। তার ছবি শুনতাম। তো সেইগুলো...

তুনাজ্জিনাঃ তার গান যেগুলো সে শুনত গান বা যে ছবি সে যেগুলো দেখে অভ্যস্ত সেগুলো তো সে এখনো ওভাবেই মানে টিভিতে যখন হয়, বা সিডি আমরা মানে দেখাতে পারি, খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে, এবং সে মেনশন করতে পারে কোন ছবি, কোন শিল্পীর ছবি, এবং সে এটা খুব মেনশন করে আমার নানুর চাচার থিয়েটারের ব্যবসা ছিল। থিয়েটারের ব্যবসা যেটা এখন কলকাতা সরকার নিয়ে নিয়েছে মিউজিয়াম বানানোর জন্য – আপনারা হয়ত নাম শুনে থাকবেন মিনার্ভা থিয়েটার ওটাকে তো মিউজিয়াম বানানো হয়েছে যেটার চারজন মালিকের মধ্যে একজন মালিক ছিলেন আমার নানুর চাচা। তো ওনারা স্টিল শেয়ার করে যে তারা আমার নানুকে নিয়ে আমার নানুর মা তাকে থিয়েটার দেখতে নিয়ে যেত। তাদের জন্য আলাদা করে পর্দাঘেরা গাড়ি আসত। যাতে বাইরের কেউ তাদেরকে না দেখে কিন্তু তারা থিয়েটার দেখতে যেত। শিল্পীর ছবি, প্রিয় শিল্পীর ছবি এবং গান তারা এখনো টিভিতে যখন হয় সেটা মেনশন করে দেখবে যে না আজকে মান্নাদের গান হচ্ছে বা আজকে সুচিত্রা সেনের ছবি হচ্ছে – এরকম বলবে – আমরা যদি চ্যানেল চেঞ্জ করতে চাই এটা কিন্তু সে কিন্তু সে খুব বলে যে না এটা আমি আমি দেখব এটা আমার খুব পছন্দ। অথবা যখন আমরা সিডি নিয়ে আসি তখন ওটা সে বসে বসে দেখে। সে আগের মুভিগুলা রিকল করে কিন্তু নতুন যা এসেছে তা সে দেখবে না। গানও সেইরকম। রবীন্দ্রনাথের গান হলে সে খুব আগ্রহ নিয়ে শোনবে, এবং বলবে যে আজকে রবিঠাকুরের গান আছে টিভিতে – সেই অনুষ্ঠান দেখবে। বিশেষ করে মান্নাদের গান হলে বা সন্ধ্যা মুখার্জীর গান হলে এগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে শোনে। এবং আগে তো টিভি ছিলনা তখন তো সে রেডিওতে রেগুলার সেইসব গান শুনত।

রুমনঃ নানুকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আপনার দেশ কোথায় বা আপনার ঘর কোথায় তাহলে আপনি যদি প্রশ্ন করেছেন কিংবা করলে উনি কি বলেছেন?

তুনাজ্জিনাঃ উনি খুব স্পেসিফিকালি উত্তর দেয়, আমার বাপের বাড়ি কলকাতা, আমরা কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। এবং আমার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে এখানকার সিলেটে। সে কখনই বলেনা আমার বাড়ি সিলেটে বা ঢাকায়। কোনদিন আমি

শুনিনি এই পর্যন্ত যে কইজন মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করেছে সে প্রত্যেককেই এই উত্তরটা দিয়েছে। আলাদা করে স্পেসিফিক করে উত্তর দিয়েছে আমরা চলে আসছি কলকাতা থেকে এই বাংলায়, বাংলাদেশে, কিন্তু আমার বাড়ি হচ্ছে কলকাতায়। আমার বাপের বাড়ি কলকাতায়। কিন্তু আমরা মেয়েরা অনেকেই শ্বশুরবাড়িকে বাপের বাড়ি বলে কিন্তু সে কখনই তা বলে না।

রুমনঃ আপনার কাছে কি মনে হয়, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনার দেশ কোথায়, আপনার ঘর কোথায়, আপনার বাড়ি কোথায় তাহলে?

তুনাজ্জিনাঃ আমার কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমি তো অবশ্যই বলব বাংলাদেশ। কারণ আমি তো বাংলাদেশে জন্মেছি, বাংলাদেশে বড় হয়েছি, বাংলাদেশেই থেকেছি। আমার নানুর কাছের শোনা স্মৃতিগুলো আমার কাছে খুব ইম্পরট্যান্ট। কারণ আমার জীবনে আমার বাবা মায়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন আমার নানু। কারণ আমি বেশির ভাগ সময়ই তার কাছেই থেকেছি। এইজন্য এত স্পেসিফিক হয়ত বা ডিটেলসে ঘটনাগুলো বলতে পারলাম। এই ঘটনাগুলো তো আমি অনেকবার শুনেছি। হয়ত খাপছাড়াভাবে শুনেছি কিন্তু অনেকবার শোনার ফলে এটা আমার বেশি মনে আছে। কিন্তু আমার দেশ বা আমার ঘর অবশ্যই আমি বাংলাদেশই বলব।

রুমনঃ তো আপনার নানুর যে স্মৃতিগুলো ১৯৪৭-এর পার্টিশনের পর বা পার্টিশনের আগের যে স্মৃতিগুলো সেগুলো কি আপনার পরবর্তী যে জেনারেশনের আসবে তাদের কাছে কি পৌঁছে দিবেন? বা দিলে কিভাবে পৌঁছাবেন দিবেন? কোন স্মৃতিগুলো?

তুনাজ্জিনাঃ আমি তো এটা অবশ্যই চেষ্টা করব যে এই ইনফরমেশনগুলো বা স্মৃতিগুলো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মানে আমার ছোট যে ভাই, বোন কিংবা পরবর্তী আমার ভাইয়ের ছেলে মেয়ে কিংবা আমার যে পরবর্তী প্রজন্ম আসবে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। এখন হুবহু একটা কথা আমি যেভাবে বলব

আমার নানুর কথা কিন্তু হুবহু সেভাবে বলতে পারব না। সেটার জন্য আমরা যেটা করেছি আমরা আমাদের মানে ভাইবোনরা আমাদের নানুকে বলেছি তুমি একটা খাতায় তোমার ছোটবেলার যতটুক মেমরি আছে সবকিছু লিখে রাখ। কারণ আমরা বলতে পারব কিন্তু তোমার ভাষায় তুমি কিভাবে দেখেছ সেটা কিন্তু আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারব না। তো সে নাকি এই রকম লিখে রেখেছে, সে বলছে তার মরার পর ওই সেই খাতাটা যেন আমরা খুলি। মানে তার যা ইনফরমেশন, তার যা বলার, সে এই খাতাটিতে নাকি লিখেছে। এবং আমরা বলি যে তোমার যা মনে আছে তুমি এই খাতাটিতে লিখে রাখ যেন কোন ইনফরমেশন মিস না হয়।

রুমনঃ আচ্ছা, আমাদের ১৯৪৭-এর যে দেশভাগ, সেই দেশভাগটা আপনার কাছে কি অর্থবহন করে?

তুনাজ্জিনাঃ আমার কাছে যে ১৯৪৭-এর দেশভাগটা শুধুমাত্র একটা অর্থই বহন করে যে বাইরের একটা শক্তি চেয়েছিল আমাদেরকে ডিভাইড করে, দুর্বল করে নিজেদের সুবিধা লুটতে। আমার কাছে সবচেয়ে বড় অর্থ এটাই মিনিং করে। কারণ একই ভাষাভাষী, এক কালচারা বহন করে এইরকম কিছু মানুষকে কি শুধুমাত্র ভৌগলিকভাবে আলাদা করে দেওয়া যায়? আমার কাছে মনে হয়না সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ, খুব একটা বেশি আলাদা আসলেই করা যায়। তবে রাজনৈতিক সুবিধা পাবে। যতবেশি ডিভাইড হব আমরা তত বেশি দুর্বল হয়ে যাব। আর ধর্মের দিক দিয়েও যদি তারা ডিভাইড করতে চায়, তাহলে তো অনেক দেশকেই আমরা একভাবে চিন্তা করতে পারি। বাংলাদেশও মুসলিম প্রধান কান্ট্রি। ঠিক একইভাবে পাকিস্তানও তাই, সৌদি আরবও তাই। কিন্তু সেই হিসাবে সৌদি আরব, পাকিস্তান, বা আফগানিস্তানের সাথে কি বাংলাদেশকে আমরা বলতে পারি যে আমরা সবাই এক জাতি, একদেশ। এটা তো সম্ভব নয়। ধর্মের ভিত্তিতেও যদি আলাদা করা হয়, সেটাও কিন্তু কোন কন্সট্যান্ট মানদণ্ড হতে পারেনা। কোন জাতিকে আলাদা করার জন্য। আমার কাছে শুধু এটাই মনে হয়, খুব মানে চতুরভাবে কাজটা করা হয়েছিল, আমাদের পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষগুলোকে মানুষকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য।

এবং আমাদের তখন কারণে তারা হয়ত আমার বোঝার ভুল হতে পারে, বুঝতে পারেনি, যে আমাদের প্রচুর দুর্বল, আমাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সুবিধা নিবে এভাবে আমাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করে। এবং আমার কাছে মনে হয় অভিন্ন ভারত থাকাটাই হয়ত সচেয়ে ভাল হত।

রুমনঃ আপনি কি আর কিছু বলবেন যা আগে বলতে পারেননি? আর কিছু বলার আছে...

তুনাজ্জিনাঃ না আমার আসলে ওইরকম সেইরকম কিছু বলার নেই তবে শুধু এইটুকুই বলার যে এই জিনিসটা বলতে পেরে আমি খুব খুশি কারণ আমার নানুর স্মৃতিগুলোও অন্তত কোথাও একটা রেকর্ড মানে কোথাও একটা মানে থাকল। কারণ এই জিনিসগুলো আমার নানু বলছে লিখে রাখতে, যাতে এই জিনিসগুলো হারিয়ে না যায়। একবার বলাতে একবার হলেও আমার পুরোটা মেমরাইজ হয়ে গেল যে তার জিনিসগুলো যে আমি জানি। আর একচুয়েলি এখানে এই কথাগুলো বলাতে আমি শুধু এতটুকুই ইয়ে করলাম আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাছে যতটুকও শুনেছি, তার কতটুকু আমি আমার ভিতরে মনে রাখতে পেরেছি, বা এটাকে গুরুত্ব দিতে পেরেছি সেটাকেই আমার কাছে খুব ভাল মনে হল। যে আমি তার কথাটা শুনে অতটুকু মনে রাখতে পারলাম কিনা। এখনকার আমাদের যা অবস্থা আমাদের এতটুকু সময় কিন্তু হয়না পরিবারের সিনিয়রদের সাথে বসে তাদের অতীত নিয়ে গল্প মানে কথা শোনার মত সময় কিন্তু একচুয়েলি হয়না।

রুমনঃ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য।

তুনাজ্জিনাঃ আপনাকেও ধন্যবাদ।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved